স্বাস্থ্যের স্বাধীনতা

ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

আফ্রিকার ঘন অরণ্যভূমি পিছনে ফেলে কিছুটা খোলামেলা বনাঞ্চল ও ঘাসে-ঢাকা সমতলে আশ্রয়, এবং তারপর ছড়িয়ে পড়া ইওরোপ আর এশিয়ায়— লক্ষ লক্ষ বছরের এই পথ-চলাই মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস। সভ্যতার প্রত্যূষে মানুষকে ভাবিত করত তার গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদ, প্রতিকূল প্রকৃতি, হিংস্র পশুর আক্রমণ, আর অবশ্যই রোগব্যাধির আশংঙ্কা। আদিম অন্ধকারের মতোই তার দু'চোখ তখন কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তাই দুর্দৈবের পিছনেই সে দেবতার অভিশাপ আর অপদেবতার রোষ দেখতে পেত। ছিল রোগমুক্তির নানা উপাচার, কখনও তা ভয়ঙ্কর নৃশংস। কিন্তু মানুষের সত্যের সন্ধান তো আর থেমে ছিল না— নিরীক্ষণ আর অনুসন্ধান তার সহজাত প্রকৃতি। এমনিভাবেই, আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সূচনা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দী থেকে, সে এক বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। তার পর একে একে যুগান্তকারী সব আবিষ্কার— ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে জেনারের গুটিবসন্তের টিকা, পাস্তুব-এর জীবাণুর সন্ধান এবং তাতে অনুপ্রাণিত ১৮৬৫ সালে লিষ্টার-এর সংক্রমণ-বিহীন শল্যচিকিৎসায় পদক্ষেপ, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং-এর পেনিসিলিন ১৯২৮ সালে, আরও কত কি! এমনিভাবেই মানুষের অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা, গভীর নিরীক্ষা আর সর্বোপরি অদম্য মনোবল ত্যাগ-পরিশ্রমে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক রহস্য-দরজা গেল খুলে। অজানার অন্ধকার পেরিয়ে জানার উদ্ভাসে আজ আমরা এতদূরে পৌঁছেছি সেখানে এত রোগব্যাধির প্রাদুর্ভাব থাকার তো কথা নয়, তবুও আছে, তার কারণ আমাদের অনেকের মধ্যেই একটি আত্ম-ছলনা কাজ করে যায়। 'এখন তো এটা খেয়েনি, অসুখ করলে দেখা যাবে' অথবা 'ওই লোকটি তো এ সব করেও দিব্বি বেঁচে আছে, আমারও কিছু হবে না।' মানসিকতায় এমনি সব নির্লিপ্ত উদাসীনতার আবরণ।

ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় একজন চিকিৎসক। স্বদেশী-বিদেশী ঈর্ষণীয় শিক্ষার ভূষণ সহজেই তাঁকে অনেক বৈভবে-স্বাচ্ছন্দে-প্রচারে ভরিয়ে তুলতে পারত। কিন্তু তিনি যে পথটি বেছে নিলেন তা চিকিৎসা-সেবায় যেমন

মহিমাময় তেমনি ত্যাগ-তিতিক্ষায়ও ভাস্বর। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে একদিন যখন দুর্গম গ্রামাঞ্চলে পৌঁছলেন তিনি, এক জন্মান্তর হল তাঁর। বুঝলেন, এখানে মানুষের দুর্ভোগ শহরজীবন থেকে শুধু বেশি নয়, ভিন্নতরও। দরিদ্র মানুষ, নিরক্ষর-সমাজ, রোগব্যাধিতে তাঁদের অসহায়তা, তাঁদের অপুষ্টি এবং সর্বোপরি কুসংস্কারের জালে বন্দিজীবন— সব কিছুই তাঁকে ভাবিয়ে তুলল। শুরু হল তাঁর পথ-চলায় এক নতুন সংযোজন— গভীর অধ্যয়ন আর অন্তরঙ্গ অভিজ্ঞতায় প্রোজ্জ্বল তাঁর লেখা প্রবন্ধ-সম্ভার। গ্রাম-শহরের সীমানা ছাড়িয়ে তাঁর এক-একটি সৃষ্টি হ'য়ে উঠল সর্বজনীন জ্ঞানের আকর। এই বইখানি তাঁর চতুর্থ প্রয়াস।

আগের মতো এ-বইয়ের বিষয়-বৈচিত্র খুবই যত্ন করে চয়ন করেছেন লেখক। অনেকেই আছেন যাঁদের গোচরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কিছু সংজ্ঞা, অসুখের নাম বা বিশ্লেষণ খবরের কাগজ, পত্রিকা, বন্ধুবান্ধব বা অন্য কোনোভাবে ইতিমধ্যেই এসে গেছে, যেমন— ফ্লুরোসিস, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, কালাজ্বর, জলবসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিয়ো, ব্লাড প্রেসার, হার্ট অ্যাটাক, কোলেস্টেরল, জন্ডিস, ডায়াবেটিস, ক্যানসার ইত্যাদি। এই বই পাঠককে আরও স্পষ্ট ধারণা দেবে এই সব বিষয়ে, কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তর তিনি খুঁজে পাবেন, স্বাস্থ্যসচেতনা বাড়বে আরও, এবং সম্ভবত, একাধিক ভুল ধারণারও অবসান ঘটবে তাঁর। লেখকের অন্য কয়েকটি প্রজ্ঞাদীপ্ত প্রতিবেদনের বিষয় সকলকে সহজেই আকৃষ্ট করবে, যেমন— মিষ্টি ও কৃমি, খেসারির ডাল, হলুদের ফাঁদে ন্যাবা, বাজিতে হাত পোড়া, গরমে গা-পোড়া, অ্যানেস-থেসিয়া, প্রসব যন্ত্রণা, মরণের পরে, আলো-আঁধারের আড়ালে, ইত্যাদি। বই-য়ে অন্যান্য আলোচনার গভীরতা ও ভাষা, উভয়ই সুন্দর।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ডা. মুখোপাধ্যায়ের লেখালেখিতে মনন ও শৈলী দিনে দিনে পরিপক্ক হয়ে উঠেছে এবং তাতে মিশেছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ঋদ্ধি, কিন্তু তার একটুও প্রাঞ্জলতা হারায়নি । আশা করি, এ বইখানিও আগের মতো পাঠককুলে যথাযোগ্য গৌরব ও সমাদর পাবে।

জানুয়ারি ২০১২ ডা. গৌররঞ্জন মণ্ডল
কলকাতা

লেখকের কথা

মানুষের ন্যূনতম চাহিদার প্রাথমিক শর্ত— স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় সক্ষমতা অর্জন এবং সম্মানজনক জীবিকা।

অথচ বিশ্বের অগণিত মানুষ আজও ক্ষুধার্ত, ন্যূনতম চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। ভারতবাসীও এই বঞ্চনার বাইরে নয়। এর থেকে মুক্তি পেতেই মানুষের জানা অজানার পথে চলা। জীবনের প্রাথমিক শর্তই শরীরের পুষ্টি। পুষ্টির অভাবে মানুষের শরীর বিভিন্ন সংক্রামক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়। সংক্রামক রোগ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হলে চাই প্রতিকার। প্রতিষেধক টিকা ও আধুনিক চিকিৎসা মানুষকে দিতে পারে নতুন জীবন। তবে সকল রোগের প্রতিবিধান এখনও অজানা। সে কারণে রোগ যাতে প্রথমেই না হয় সে চেষ্টাই সকলের প্রধান ও প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত। রোগ সম্পর্কে ভুল ধারণা, কুসংস্কার, কুঅভ্যাস ইত্যাদি মানুষের জীবনকে সংকটের মুখে ফেলে দেয়। রোগ সম্পর্কে অবহিত হলে সাধারণ মানুষ নিজে সাবধান হতে পারে। ভুল ধারণা শুধরে নিতে পারে। সে জন্য এ বইয়ের অবতারণা। রোগের চিকিৎসার অংশটি ইচ্ছে করে লেখায় উহ্য রাখা হয়েছে। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। সুতরাং জনগণের ওপর সে দায়ভার তুলে দেওয়ার ঝুঁকি লেখক নিতে রাজি নয়। এ ছাড়াও চিকিৎসার কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। সে কারণে চিকিৎসকের ওপরই সে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন রোগের অজানা বিষয় নিয়ে নিরন্তর গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আবার চিকিৎসার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান নিয়েও ভাবিত। এ বইতে সে সব কিছু লেখা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলি লেখার জন্য বিভিন্ন চিকিৎসা বিজ্ঞানের বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন ও পত্রিকার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সে সব লেখকদের কাছে আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষায় রাষ্ট্রের ভূমিকার একটি

ধারাবাহিক চিত্র 'ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের স্বাধীনতা' প্রবন্ধ দিয়ে সূচনা করা হয়েছে।

দৈনিক 'কালান্তর' পত্রিকায় কখনও নিজের নামে কখনও 'বদ্যিনাথ' বা 'স্বাস্থ্যকর্মী' নামে বেশিরভাগ পবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে। সে জন্য আমি 'কালান্তর' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থের ভূমিকা লেখার দায়িত্ব আমার বন্ধুবর ডা. গৌর মণ্ডল গ্রহণ করাতে আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। পূর্বে আমার দু'টি বই প্রকাশনার সময়ও গৌরকে আমি পাশে পেয়েছি। সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও জ্ঞান আমাকে মুগ্ধ করে। বইয়ের সংক্ষিপ্তসারও লেখার দায়িত্ব তিনি নেওয়াতে আমাকে আর একজনকে খুঁজতে হয়নি।

ভাস্কর্য্য ও চিত্রশিল্পী শ্রীদেবাশীষ মল্লিক চৌধুরী-র পরামর্শে বই-এর প্রচ্ছদ তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। সেজন্য আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

বই প্রকাশনার দায়িত্ব নেওয়ার জন্য আমি প্রকাশক শ্রীসন্দীপ নায়ক-এর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ ও ঋণী।

অবশেষে বাড়ির সবার কাছে আমি বিশেষভাবে ঋণী আমার বাউন্ডুলেপনাকে সহ্য করার জন্য। আমার বাড়ির দু'টি কুকুর রকি ও রকি জুনিয়ার যাকে আমি রকিজী বলেই বন্ধুদের কাছে পরিচয় দিতাম তাদের মৃত্যু আমাকে ভীষণভাবে শোকাহত করেছে। সে শোক এখনও আমাকে কাতর করে। এ বই তাদের আত্মার প্রতিও উৎসর্গিত।

জানুয়ারি ২০১২
কলকাতা

ডা. সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের স্বাধীনতা	১৩
এ পাপ থেকে কবে মুক্তি পাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানুষ	১৮
স্বাস্থ্যের একটি দিক উপোস	২২
মিষ্টি খেলেই কৃমি হয় না	২৪
রক্তাল্পতার একটি কারণ— বক্রকৃমির সংক্রমণ	২৬
অপুষ্টির অন্যতম কারণ— গোলকৃমির সংক্রমণ	২৯
খেসারির ডাল থেকে সাবধান	৩২
আয়োডিনের অভাব	৩৪
ফ্লুরোসিস	৩৬
শরীরের প্রয়োজনে দস্তা	৩৭
খেতে পারি কিন্তু কেন খাব	৩৮
জীবাণু নিয়ে কিছু কথা	৪১
বিশ্ববাসীর জন্য কলম্বিয়ার উপহার	৪৪
ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে সামাজিক দায়	৪৬
প্লেগের আকস্মিক উত্থান	৫০
কালাজ্বরের প্রত্যাবর্তন	৫৫
সর্দি কাশির মরসুমে	৫৭
জার্মান মিজলস	৫৮
জলবসন্ত	৬১
ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী	৬৩
ভাইরাস সার্স	৬৬
রক্তগ্রহীতা ও হেপাটাইটিস	৬৮

পালস্ পোলিয়ো প্রোগ্রাম ৭০
অপরিচিত রোগ পরিচিত নাম ৭৩
ডেঙ্গুর আদিখ্যেতা ৭৫
ফুট অ্যান্ড মাউথ রোগ ৭৮
লেপটোস্পাইরাইকটিকোহেমারেজিকা ৮০
যুদ্ধে জীবাণু অস্ত্র - গুটি বসন্ত ও অ্যানথ্রাক্স ৮২
ব্লাড প্রেসার নিয়ে কিছু কথা ৮৪
হার্টের অসুখ থেকে সাবধান ৮৭
ভালো ও খারাপ কোলেস্টেরল ৯০
নিউমোকোনিয়োসিস ৯৩
জন্ডিসের রকমফের ৯৬
হলুদের ফাঁদে ন্যাবা ৯৮
বাজিতে হাত পুড়েছে ১০০
গরমে গা পুড়ে যাচ্ছে ১০২
ডায়াবেটিসের জটিলতা ১০৫
অ্যানেসথেসিয়া ১০৭
প্রসবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি ১০৯
পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির অবহেলা ১১১
মরণের পরে ১১৩
আলো আঁধারের আড়ালে ১১৫
প্রায়ণ একটি সংক্রামক প্রোটিন ১১৮
নিরাময়ের প্রতীক্ষায় ক্যানসার ১২১
ক্যানসার নিয়ে গবেষণা ১২৪
গ্রুপবিহীন রক্ত ১২৭
তুষার মানব ১৩০
মেডিক্যাল কলেজে হাজিরার নমুনা ১৩১
বন্ধ হোক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বেচাকেনা ১৩৪
মানবতার নামে ত্রাণ নিয়ে ওষুধ কোম্পানির ব্যবসা ১৩৬
সবার জন্য স্বাস্থ্য কি অলীক স্বপ্ন ১৩৯

ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের স্বাধীনতা

১৫ অগাস্ট স্বাধীন ভারত তার ষাট বছর পূর্ণ করতে চলেছে। সেদিন জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে কুচকাওয়াজ, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনিতে আকাশবাতাস মুখরিত হবে। পত্রিকা, বেতার, দূরদর্শন সবাই যেন একই সুরে মেতে উঠবে। এরই মধ্যে অনেকে স্বাধীনতার উদ্দামতায় মাতাল হয়ে রক অ্যান্ড রোল, ব্রেক ড্যান্স ও নেশার ফোয়ারায় উপচে ফেলবে নিজেদের আবেগকে। আর শিশুরা, স্বাধীনতার জন্মদিনে কেক কেটে কোরাস গাইবে-— "হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ ইনডিপেনডেন্স, হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ।"

তবে আমাদের মতো কতিপয় ব্যক্তি আছেন যাঁরা কোনও ঘটনাকে তির্যক ভাবে দেখার অভ্যাস এখনও ত্যাগ করতে পারেননি। তাঁরা জানতে চায়, যে দেশবাসীর জন্যে এই স্বাধীনতা তারা আখেরে কী পেল?

তারই হিসেবনিকেশ করতে ক্রোড়পত্র বের করতে হল। এতে দেশবাসীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনচিত্র অনেকটাই হয়তো বেরিয়ে আসবে। তবে একে পূর্ণাঙ্গরূপে পেতে হলে ভারতে ১০০ কোটি মানুষের স্বাস্থ্যকে বিচ্ছিন্ন রেখে সম্ভব নয়। জনস্বাস্থ্যের মূল্যায়নে সুদূর অতীত থেকে বর্তমানে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনাহ বা কী, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার প্রচেষ্টা এই লেখায়।

প্রাচীনকাল থেকে এই উপমহাদেশে সভ্যতার একটা ঐতিহ্য আছে। এখানে প্রায় সাড়ে চার হাজারেরও বেশি সময় আগে সিন্ধু সভ্যতা সেই সাক্ষ্য বহন করে। মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পায় সর্বসাধারণের জন্য স্নানাগার, উন্নত পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা, দু'বছরের জন্য শস্যভাণ্ডার ইত্যাদি স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সচেতনারই বহিঃপ্রকাশ। পরবর্তী পর্যায়ে আর্যদের আগমন ও স্থায়ীভাবে বসবাসকালে আয়ুর্বেদ রচনা অতীতের ধারাকে সমৃদ্ধ করে।

মনুসংহিতায় ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যসুরক্ষা, খাদ্যাভ্যাস, জন্ম-মৃত্যুকালে নানাবিধ স্বাস্থ্যবিধি সংকলিত আছে।

'সর্বে সুখিনঃ ভবন্তু'। সবাই সুখী হোক, সে সময়কার মনীষীদের কথা। বেদ পরবর্তী যুগে তক্ষশীলা ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বে সমাদৃত হয়েছিল। দেশবিদেশের ছাত্ররা এখানে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে আসতেন। মোঘল আমলে ভারতে আরবিক চিকিৎসাপদ্ধতি বিস্তার লাভ করে যা 'ইউনানি' বলে আজও প্রচলিত।

অতঃপর বিটিশ শাসনকালে ভাবতে আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অ্যালোপ্যাথির প্রসার ঘটে। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারত সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বে আসে। ১৮৫৯ সালে ভারতে অবস্থানরত ব্রিটিশ সৈন্যদের স্বাস্থ্যরক্ষার স্বার্থে বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি নিবারণের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। সে কারণে সীমিত পরিসরে পরিশোধিত জল সরবরাহ ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

১৯০৪ সালে দেশে ব্যাপকভাবে প্লেগের মহামারী দেখা দিলে ব্রিটিশ সরকার জরুরিভিত্তিক কমিশন গঠন করে। পরবর্তী পর্যায়ে সীমিত আকারে ব্রিটিশ সরকার বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মসূচি ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় আইন পাস করে। অবশেষে ১৯৪৬ সালে 'ভোরা কমিটি' সমস্ত দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সার্বিক মূল্যায়ন করে এবং জনস্বাস্থ্য, রোগ উপশম, চিকিৎসাবিদ্যা ও গবেষণা, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি পেশ করে। এতৎসত্ত্বেও ভারতবাসীর জীবন দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে নিস্তার পায় না।

স্বাধীন সার্বভৌম ভারত, দেশবাসীকে তাদের দুঃখ-দারিদ্র থেকে মুক্ত করবে এই ছিল সবার প্রত্যাশা। অবশেষে হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতবিরোধ ও দেশভাগের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে ১৫ অগাস্ট আমাদের দেশ স্বাধীনসত্তা পায়। দেশবাসীর আশাকে পূর্ণ করতে ভারতের সংবিধান জনকল্যাণ-রাষ্ট্র হিসাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সংবিধানে স্বাস্থ্যনীতি সম্পর্কে বলা হয় "এই বাষ্টের প্রাথমিক কর্তব্য হবে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো।"

১৯৫১ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়ের জন্য রাখা হয়। সে সময়ে যক্ষ্মা দূরীকরণে সকল

শিশুকে যক্ষ্মার প্রতিষেধক বি. সি. জি. টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, কুষ্ঠ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে দেশব্যাপী উদ্যোগও নেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের ৫ শতাংশ এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় কমে এসে দাঁড়ায় ৪.৩ শতাংশে। ১৯৬২ সালে গুটিবসন্ত নির্মূলসাধনে, আয়োডিন অভাবজনিত গলগন্ড নিবারণে এবং জেলাভিত্তিক যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রম গ্রহণ করায় দেশবাসীর মনে আশার সঞ্চার ঘটে।

সদ্যস্বাধীন দেশে বেশির ভাগ মানুষের জীবনের অন্তরায় দারিদ্র্য। দারিদ্র্য মানেই পুষ্টির অভাব। সে কারণে গরিব মানুষের পুষ্টির উন্নতির জন্য ভারত সরকার, ইউনিসেফ, ফাউ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তা গ্রহণ করে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৬ হাজার কোটি টাকার মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে ৮৪০ কোটি এবং পরিবার পরিকল্পনায় ৩১৫ কোটি টাকা ধার্য হয়। ১৯৭১ সালে শিল্প-শ্রমিকদের জন্য অবসরভাতা কার্যকরী হয়। চিকিৎসার প্রয়োজনে মহিলাদের গর্ভপাত করানোর জন্য ১৯৬৯ সালে সংসদে বিল পাস হয়।

এটা লক্ষণীয় চাব-চারটি পরিকল্পনা রূপায়িত হওয়ার পর দেশের খেটে খাওয়া মানুষের দুর্দশা মেটে না। অপুষ্টি ও নিরক্ষরতায় ভারতের স্থান প্রথম সারিতেই থেকে যায়। তাই দরকার পড়ে পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পবিকল্পনায় দেশবাসীর ন্যূনতম প্রয়োজনে মেটাবার কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, গ্রামীণ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, গ্রামীণ রাস্তাঘাট, পানীয় জল সরবরাহ, বাসস্থান, বস্তি উন্নয়ন ও গ্রামীণ বৈদ্যুতিকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সালে ভারত গুটিবসন্ত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়। ওই বছরেই শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে জাতীয় শিশুকল্যাণ বোর্ড গঠিত হয়।

১৯৮২ সালে ভারত সরকার জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করে। ১৯৮৪ সালে ডিসেম্বরের ২-৩ তাবিখে ভূপালে মর্মান্তিক গ্যাস দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ২৫০০ মানুষের মৃত্যু এবং ৫০ হাজার মানুষ বিষাক্ত গ্যাসে আক্রান্ত হয়। ১৯৮৫ সালে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা নির্দেশিত ইউনিসেফের সহায়তায় বিশ্বব্যাপী টিকাদানের কর্মসূচি প্রাধান্য পায়।

এটা মনে রাখা দরকার যে, কোনও সমাজজীবনে মা ও শিশু

অগ্রাধিকারগণ্য। আমাদের মতো দেশে জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশই এদের দ্বারা পরিবৃত। ভারতে ১৫ থেকে ৪৪ বছর পর্যন্ত নারীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ২২ শতাংশ আর ১৫ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ৪০ শতাংশ। এই পরিসংখ্যান থেকে সহজেই অনুমেয় মা ও শিশুর কল্যাণ ব্যতিরেকে ভারতের মতো দেশে জনস্বাস্থ্যের মান উন্নয়ন সম্ভব নয়। সে কারণে সপ্তম পরিকল্পনায় মা ও শিশুর স্বাস্থ্যোন্নতির ওপর জোর পড়ে। একে বাস্তবায়িত করতে গর্ভবতী, প্রসূতি মায়েদের ও ৫ বছর পর্যন্ত শিশুদের জন্য 'অঙ্গনওয়াড়ি' কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। অর্থের ঘাটতি ও ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি থাকায় আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। সে কারণে অষ্টম পরিকল্পনায় সময়ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করার ওপর জোর পড়ে। ২০০০ সালের মধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির লক্ষ্যমাত্রা ঠিক হয়। এতে শিশুমৃত্যুর হার ৮০ থেকে ৬০ এবং ১ লক্ষ জীবিত শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মায়েদের মৃত্যুকে ৪০০ থেকে কমিয়ে ২০০তে নামানো, নবজাত শিশুর ওজন যাতে বৃদ্ধি পায় সে জন্য গর্ভবতী থাকাকালীন মায়েদের পুষ্টির উন্নতি, জন্মহার ৩০ থেকে ২১ নামিয়ে আনা ইত্যাদি অঙ্গীভূত হয়।

দীর্ঘ স্বাধীনোত্তর ইতিহাসে জনস্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিভিন্ন পদক্ষেপ কতটা কার্যকরী হয়েছে কিংবা যা নেওয়া হয়েছে তা যথেষ্ট কি না সে প্রশ্ন থেকেই যায়। অন্য দিকে এটাও ভাবায় ভারতবাসী তার ও নিজের সন্তানের উন্নতির জন্য সত্যি কি আন্তরিক? যে ব্যাকুলতা ব্যক্ত হলে হয়তো অন্য একটা জনস্বাস্থ্যের চিত্র পাওয়া যেত।

ভারতবাসীর স্বাস্থ্যের চিত্র (২০০৫-২০০৬)

- জনসংখ্যা (১০২ কোটি ৯৭০ হাজার +)
- লিঙ্গ অনুপাত নারী (প্রতি ১০০০ পুরুষ) ৯৩৪
- সাক্ষরতা ৬৪.৪ %
- শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৫৮
- প্রতি লক্ষ জীবিত শিশুর জন্ম দিতে গিয়ে মাতৃত্বকালীন মৃত্যু ৩০১
- শিশু শ্রমিক ১১.৮ %
- শিশু পুষ্টি

❑ ৫ বছরের নীচে বয়স অনুপাতে ওজন ও উচ্চতা

কম উচ্চতার শিশু ৪৮ %

কম ওজনের শিশু ৪৩ %

❑ রক্তাল্পতা ৫ থেকে ৫৯ মাসের শিশুর

অল্প রক্তাল্পতা (হিমোগ্লোবিন ১০ গ্রাম থেকে ১০.৯ গ্রাম) ২৬ %

মাঝারি " (হিমোগ্লোবিন ৭ গ্রাম থেকে ১০ গ্রাম) ৪০ %

অত্যধিক " (হিমোগ্লোবিন ৭ গ্রামের কম) ৩ %

● অন্ধত্ব ৬৮ লক্ষ

❑ ছানি ৬৭ %

❑ গ্লোকোমা ৫.৮ %

চোখে আঘাতজনিত ১.২ %

মণি নষ্ট হয়ে যাওয়া ১৯ %

(এখানে মণি প্রতিস্থাপন, দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারে এর জন্য দরকার মরণোত্তর চক্ষুদান)

● যক্ষ্মা।

❑ ১৫ থেকে ৫৯ বছর বয়সের জনসংখ্যার মধ্যে সাধারণত যক্ষ্মা রোগের উপস্থিতি প্রতি এক লক্ষে ৫৩ জনের বেশি হওয়া উচিত নয়।

ভারতে ৫১৯ প্রতি ১ লক্ষে

৬০ বছরের ঊর্ধ্বে ৯৯৪ প্রতি ১ লক্ষে

ভারতে ৩৩ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়

৩.৫ লক্ষ মানুষ যক্ষ্মায় মারা যায় প্রতি বছর

● ম্যালেরিয়া

❑ ভারতে প্রতি বছরে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৯৪ লক্ষ, এর মধ্যে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় ৪৩ লক্ষ মানুষ। ২০০৪ সালে ভারতে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু ৪৩৮ জন।

● পোলিয়ো

২২৫ জন (২০০৩ সালে)

৮ জন (২০০৪ সালে)

গুটি বসন্তের মতো পোলিয়ো রোগকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথিবী থেকে নির্মূল করতে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পালস পোলিয়ো কর্মসূচি।